বণিক বার্তা

13 APR 2026

সানেমের সেমিনারে বক্তারা

শিল্প ও বাণিজ্য নীতির সমন্বয়হীনতা দেশে অর্থনৈতিক রূপান্তরে বাধা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক রূপান্তর বা ট্রানজিশন পিরিয়ডে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে শিল্প ও বাণিজ্য নীতির মধ্যকার দীর্ঘদিনের সমন্বয়হীনতা। এ অভ্যন্তরীণ নীতিগত অসামঞ্জস্যের পাশাপাশি বড় কোনো আঞ্চলিক বাণিজ্য জোটে বাংলাদেশের অনুপস্থিতি দেশটিকে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় ক্রমে পিছিয়ে দিচ্ছে। ফলে ২০২৯ সালে এলডিসি-উত্তরণ পরবর্তী সময়ে রফতানি বাজারে বড় ধরনের ধসের শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

গতকাল রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে আয়োজিত 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক রূপান্তর: বাণিজ্য, সক্ষমতা এবং কাঠামোগত সংস্কার' শীর্ষক সেমিনারে এসব বিষয় উঠে আসে। সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম) ও অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশন কার্যালয়ের ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড ট্রেড (ডিএফএটি) যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও সানেমের নির্বাহী পরিচালক ড. সেলিম রায়হান। প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (রফতানি) আব্দুর রহিম খান।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, বর্তমানে বাংলাদেশের শিল্প নীতি ও বাণিজ্য নীতি অনেক ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী অবস্থানে রয়েছে। শিল্প নীতি যেখানে উচ্চ শুল্কহারের মাধ্যমে আমদানির বিকল্প দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা দিচ্ছে, সেখানে বাণিজ্য নীতি রফতানি বহুমুখীকরণে কার্যকর সুফল আনতে পারছে না। এ উচ্চ শুল্ক কাঠামোর কারণে উদ্যোক্তারা বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতার চেয়ে সুরক্ষিত অভ্যন্তরীণ বাজারে পণ্য বিক্রি করতেই বেশি আগ্রহী হচ্ছেন। এ প্রক্রিয়াকে রফতানিবিরোধী ঝোঁক হিসেবে চিহ্নিত করে তিনি বলেন, এ সমন্বয়হীনতা দূর করা না গেলে শুধু তৈরি পোশাক খাতের ওপর ভর করে উন্নত অর্থনীতির লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়।

সেমিনারে ড. সেলিম রায়হান বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে ভিয়েতনাম বা ভারতের মতো প্রতিযোগী দেশগুলো যখন বিভিন্ন বড় আঞ্চলিক বাণিজ্য জোটের সদস্য হয়ে শুল্কমুক্ত সুবিধা ভোগ করছে, বাংলাদেশ সেখানে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। বৈশ্বিক বাণিজ্যে আঞ্চলিক জোট যেমন রিজিওনাল কমপ্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ (আরসিইপি) ও ইন্দো-প্যাসিফিক ইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্ক (আইপিইএফ) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তবে বাংলাদেশ এসব জোটের বাইরে থাকায় আঞ্চলিক ভ্যালু চেইনে অংশগ্রহণ সীমিত হচ্ছে। একই সঙ্গে কম শুল্কে বাজারে প্রবেশের সুযোগ হারাচ্ছে। ফলে বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণে পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে।

সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, '২০১০ থেকে ২০২১ সালের তথ্য-উপাত্ত দেখলে দেখা যায়, বাংলাদেশের রফতানি খাত এখনো ৯০ শতাংশ নিম্ন প্রযুক্তির পণ্যের ওপর নির্ভরশীল। বিপরীতে, ভিয়েতনাম তাদের নিম্ন প্রযুক্তির পণ্য রফতানি ৪৫ থেকে ২৫ শতাংশে নামিয়ে এনেছে এবং উচ্চ ও মাঝারি প্রযুক্তির পণ্যের রফতানি ৫৫ শতাংশে উন্নীত করেছে। ফলে আমাদের জিডিপি প্রায় সমান হওয়া সত্ত্বেও ভিয়েতনামের রফতানি যেখানে ৩৮০ বিলিয়ন ডলার সেখানে আমাদের মাত্র ৪৮ বিলিয়ন ডলার।'

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আব্দুর রহিম খান বলেন, 'আমাদের রফতানি ঝুড়ি এখনো বৈচিত্র্যময় নয়। বিশ্ববাজার যেখানে ৭০-৭৫ শতাংশ ম্যানমেইড ফাইবারের দিকে ঝুঁকেছে, আমরা সেখানে তুলা বা সুতিবস্ত্র নিয়ে সন্তুষ্ট আছি। এছাড়া আমাদের দেশে পলিসি সিকিউরিটির অভাব রয়েছে। একটি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরির পরদিনই তা পরিবর্তন করা হয়, ফলে মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না। এমনকি মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত জাতীয় ট্যারিফ পলিসিও অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত না হয়ে উপেক্ষিত থাকছে।'

সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন অস্ট্রেলিয়ার ডেপুটি হাইকমিশনার ক্লিনটন পব। এতে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ সরকারি-বেসরকারি সংস্থার বিভিন্ন প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বণিক বার্তা

1 3 APR 2026

বিশ্ববাজারে অবস্থান তৈরির সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশী পণ্যের

শুরুতেই একটু জানতে চাই, পিকেএসএফ কেমন চলছে? বর্তমান পরিস্থিতি কী?

পিকেএসএফ খুব ভালো চলছে। আমি বলব, বর্তমানে এক ধরনের মেটামরফোসিসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে পিকেএসএফ। মেটামরফোসিস বলতে আমরা বুঝি, সবসময় পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের কাজের ধরনকে মানিয়ে নেয়া। শুধু মানিয়ে নেয়া নয়, এক পর্যায়ে সেই পরিবর্তন একটা গুণগত রূপান্তরে পৌঁছায়। যেমন শুঁয়োপোকা থেকে হঠাৎ প্রজাপতি বের হয়। আমরা আগামী পাঁচ বছরের জন্য একটা কৌশলগত পরিকল্পনা করেছি। সেখানে একটি ভিশন নিয়ে এগোচ্ছি। এতদিন মাঠপর্যায়ে যে পরিবর্তনগুলো আমরা করেছি, সেগুলোর ধারাবাহিকতায় এখন বড় ধরনের রূপান্তরের সময় এসেছে বলে আমাদের মনে হয়। আমরা এখন টেক-অফ করতে চাই।

এতদিন আমরা যেটা করতাম, সেটা ছিল 'ডেট-ইনস্ট্রুমেন্ট' ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম। এর কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। এখন সেই জায়গা থেকে সরে এসে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রচলিত কাঠামো থেকে মানুষকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়া নিয়ে কাজ করছি। সেই অনুযায়ী আমরা আমাদের কাজগুলো গঠন ও পুনর্গঠন করছি। এজন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াচ্ছি। আমাদের কাজ এখন তিনটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

ডিসেন্ট এমপ্লয়মেন্ট (কার্যকর কর্মসংস্থান), রিস্ক মিটিগেশন (ঝুঁকি কমানো) ও মানুষের সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা। আমরা প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রতিষ্ঠান। এখানে 'প্রতিষ্ঠান' বলতে আমরা শুধু অর্গানাইজেশন বুঝি না—বরং এমন একটি মূল্যবোধভিত্তিক কাঠামো বুঝি, যেটা টেকসইভাবে সেবা দিতে পারে।

আমাদের যে প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে, সেগুলোর মূল ভিত্তি হচ্ছে—এ দেশের নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীকে সেবা দেয়া। তাদের টেকসইভাবে আয় বাড়ানো, সম্পদ সৃষ্টি করা, উন্নতির পথে এগিয়ে নেয়া এবং ঝুঁকি মোকাবেলার সক্ষমতা বাড়ানো। এ বিষয়গুলোতেই আমরা কাজ করি।

এ কাজগুলো করার জন্য মাঠপর্যায়ে যে মূল্যবোধভিত্তিক এবং টেকসই প্রতিষ্ঠান দরকার, সেগুলো গড়ে তুলতে আমরা অর্থায়ন থেকে শুরু করে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন—সব ক্ষেত্রেই কাজ করি। তাই পিকেএসএফকে বলা যায় একটি 'ইনস্টিটিউশন-বিল্ডিং অর্গানাইজেশন', যা অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করে।

বৈশাখকেন্দ্রিক অর্থনীতিতে এ নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা কেমন? এ অর্থনীতিকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

বৈশাখ একটি বড় উৎসব, যা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এ ধরনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অর্থনৈতিক সম্পদে রূপান্তর করা যায়। পহেলা বৈশাখের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো—এ সময় আকস্মিকভাবে চাহিদা বেড়ে যায়। রঙতুলি থেকে শুরু করে পোশাক-আশাক, মিষ্টান্নসহ নানা ক্ষেত্রেই বিশাল চাহিদা তৈরি হয়। কিন্তু এ চাহিদা পূরণের জন্য অনেক আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে হয়। এ পণ্যগুলো সাধারণত বড় করপোরেট প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে পারে না। এগুলো মূলত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারাই তৈরি করে। এ ধরনের উৎসব অর্থনীতির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও ন্যায্যতাভিত্তিক বণ্টন। এখানে যে আয় তৈরি হয়, তা অনেক মানুষের

মো. ফজলুল কাদের
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পিকেএসএফ

পিকেএসএফ

পরিবহন খাত—সবকিছুই এতে যুক্ত হয়। ফলে অল্প সময়ের জন্য হলেও অর্থনৈতিক কার্যক্রমের আকার অনেক বেড়ে যায়।

পিকেএসএফের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো এখানে কী ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে?

এ সময় অর্থনীতিতে শত শত এমনকি হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয়। এ লেনদেনগুলোকে যদি ডিজিটাল করা যায়, তাহলে এগুলো গ্রহণযোগ্য আর্থিক ডেটায় পরিণত হবে। এর ফলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণপ্রাপ্তির যোগ্যতা অনেক বাড়বে। এতে তারা ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থা থেকে সহজে অর্থায়ন পেতে পারবে এবং কার্যক্রম আরো বিস্তৃত করতে পারবে। আমরা তাদের সে ডিজিটাল সক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করছি।

আরেকটি বিষয় হলো, এ ধরনের ছোট উদ্যোক্তাদের পণ্যগুলোকে ব্র্যান্ডিং করা দরকার। বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি মানুষ বিদেশে থাকে। এ ডায়াসপোরা মার্কেটে আগে থেকেই পহেলা বৈশাখকে কেন্দ্র করে মার্কেটিং করা যেতে পারে। যদি বৈশাখের এক মাস আগে থেকেই পণ্যগুলো ওই বাজারে পৌঁছে দেয়া যায়, তাহলে উদ্যোক্তারা আরো ভালো দাম পাবে। একই সঙ্গে বিদেশে থাকা বাংলাদেশীরা তাদের সাংস্কৃতিক বন্ধনটাও ধরে রাখতে পারবে। দেশের সঙ্গে সংযোগটা আরো শক্তিশালী হবে। এ-জায়গাগুলোতে আমাদের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ করার বড় সুযোগ আছে।

বৈশাখকে কেন্দ্র করে কি ঋণের চাহিদা বাড়ে?

হ্যাঁ, এ সময় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের স্বল্পমেয়াদি ঋণের প্রয়োজন হয়। এ ধরনের কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য হলো—হঠাৎ করে চাহিদা বাড়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সাধারণত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এ ধরনের স্বল্পমেয়াদি ঋণ দেয় না। এখানে তাদের প্রডাক্টগুলো পুনর্গঠন ও সাজানোর সুযোগ আছে। একই সঙ্গে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে ঋণগ্রহীতার বিশ্বাসযোগ্যতা বুঝতে পারে, সেজন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান সহজে আস্থা পেতে পারে।

মৌসুমভিত্তিক এ ব্যবসাগুলোকে কীভাবে টেকসই রূপান্তর করা যায়?

পহেলা বৈশাখ প্রতি বছরই আসে। এ পুনরাবৃত্তির কারণে এটাকে পরিকল্পিতভাবে অর্থনীতির অংশে পরিণত করা সম্ভব। শুধু উৎসবকেন্দ্রিক না থেকে আমরা একে আরো বিস্তৃতভাবে দেখার চিন্তা করছি। এ ধরনের উৎসবকে কেন্দ্র করে কিছু পণ্যের হঠাৎ চাহিদা তৈরি হয়। সেই চাহিদা মেটাতে গিয়ে আমাদের শাড়ি, কাপড়, পাঞ্জাবির ডিজাইন ও বৈচিত্র্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। কারিগররা নতুন নতুন পণ্য তৈরি করছে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এ পরিবর্তনটা চলমান। আজ থেকে ৫০ বছর আগে যে ধরনের পণ্য তৈরি হতো, এখন আর সেগুলো হয় না। এটা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার মধ্যেই যদি আমরা ডিজাইন উন্নত করতে পারি, পণ্যের গুণগত মান বাড়াতে পারি, তাহলে এগুলো আমাদের সাংস্কৃতিক সম্পদ হিসেবে বিশ্ববাজারেও জায়গা করে নিতে পারে। বিশ্বের অন্য দেশেও এমন উদাহরণ আছে। যেমন মেক্সিকোর-ঐতিহ্যবাহী পোশাক এখন বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে, এমনকি যারা মেক্সিকান না, তারাও তা পরছে। আমাদের দেশের পাঞ্জাবিও একসময় এভাবে আন্তর্জাতিকভাবে জনপ্রিয় হতে পারে, যদি আমরা ডিজাইন ও গুণগত মানে উন্নতি করতে পারি।

আমাদের দেশে আরো অনেক বৈচিত্র্যময় পণ্য আছে, বিশেষ করে পরিবেশবান্ধব পণ্য। মৃত্তিকা দিয়ে তৈরি অলংকারসহ নানা ধরনের হস্তশিল্প এখন নতুনভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে। বিশ্বে এখন একটি প্যারাডাইম শিফট হচ্ছে। 'ইকোলজিক্যালি ফ্রেন্ডলি' পণ্যের চাহিদা বাড়ছে। এ সুযোগে যদি আমরা পণ্যের ডিজাইন উন্নত করতে পারি এবং একটি প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা তৈরি করতে পারি, তাহলে বিশ্ববাজারে দীর্ঘমেয়াদে অবস্থান তৈরি করা সম্ভব।

গ্রামীণ অর্থনীতি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দক্ষতা উন্নয়নে পিকেএসএফ কী ধরনের ভূমিকা পালন করছে?

শুরু থেকেই পিকেএসএফ এ ক্ষেত্রে কাজ করছে। গত প্রায় ৩৫ বছরে আমরা প্রায় ৪০ লাখ মানুষকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়েছি। এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এখন আমরা এ প্রশিক্ষণের সঙ্গে প্রযুক্তিকে আরো বেশি যুক্ত করছি, যাতে উদ্যোক্তারা প্রযুক্তিভিত্তিক পণ্য তৈরি করতে পারে। পাশাপাশি আমরা তাদের বিভিন্ন ধরনের সনদ নেয়ার জন্য সহায়তা করছি। কারণ বিশ্ববাজারে যেতে হলে আন্তর্জাতিক মানের সনদ প্রয়োজন।

বিশ্বে অনেক নিশ মার্কেট ও বুটিক মার্কেট আছে—যেগুলো ছোট হলেও উচ্চমূল্যের বাজার। যেমন রিসাইকেলড পণ্য, ন্যাচারাল ডাই—এসবের আলাদা বাজার আছে। এগুলো ছোট ছোট হলেও একত্রে একটি বড় বাজার তৈরি করে। চীন এ ধরনের বাজারের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করে উচ্চমূল্যের ভ্যালু-অ্যাডেড পণ্য বিক্রি করছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা কাজ করছি।

এ পর্যন্ত পিকেএসএফ প্রায় ১৫০টির মতো পণ্যের সনদ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করেছে। পাশাপাশি আমরা ঢাকার শ্যামলীতে একটি মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ প্রমোশন সেন্টার স্থাপন করছি। সেখানে মাইক্রো উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রদর্শন, বাজার সংযোগ এবং উচ্চমূল্যের বাজারে

রয়েছে বাংলাদেশী পণ্যের

শুরুতেই একটু জানতে চাই, পিকেএসএফ কেমন চলছে? বর্তমান পরিস্থিতি কী?

পিকেএসএফ খুব ভালো চলছে। আমি বলব, বর্তমানে এক ধরনের মেটামরফোসিসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে পিকেএসএফ। মেটামরফোসিস বলতে আমরা বুঝি, সবসময় পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের কাজের ধরনকে মানিয়ে নেয়া। শুধু মানিয়ে নেয়া নয়, এক পর্যায়ে সেই পরিবর্তন একটা গুণগত রূপান্তরে পৌঁছায়। যেমন শুঁয়োপোকা থেকে হঠাৎ প্রজাপতি বের হয়। আমরা আগামী পাঁচ বছরের জন্য একটা কৌশলগত পরিকল্পনা করেছি। সেখানে একটি ভিশন নিয়ে এগোচ্ছি। এতদিন মাঠপর্যায়ে যে পরিবর্তনগুলো আমরা করেছি, সেগুলোর ধারাবাহিকতায় এখন বড় ধরনের রূপান্তরের সময় এসেছে বলে আমাদের মনে হয়। আমরা এখন টেক-অফ করতে চাই।

এতদিন আমরা যেটা করতাম, সেটা ছিল 'ডেট-ইনস্ট্রুমেন্ট' ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম। এর কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। এখন সেই জায়গা থেকে সরে এসে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রচলিত কাঠামো থেকে মানুষকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়া নিয়ে কাজ করছি। সেই অনুযায়ী আমরা আমাদের কাজগুলো গঠন ও পুনর্গঠন করছি। এজন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াচ্ছি। আমাদের কাজ এখন তিনটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

ডিসেন্ট এমপ্লয়মেন্ট (কার্যকর কর্মসংস্থান), রিস্ক মিটিগেশন (ঝুঁকি কমানো) ও মানুষের সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা। আমরা প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রতিষ্ঠান। এখানে 'প্রতিষ্ঠান' বলতে আমরা শুধু অর্গানাইজেশন বুঝি না—বরং এমন একটি মূল্যবোধভিত্তিক কাঠামো বুঝি, যেটা টেকসইভাবে সেবা দিতে পারে।

আমাদের যে প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে, সেগুলোর মূল ভিত্তি হচ্ছে—এ দেশের নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীকে সেবা দেয়া। তাদের টেকসইভাবে আয় বাড়ানো, সম্পদ সৃষ্টি করা, উন্নতির পথে এগিয়ে নেয়া এবং ঝুঁকি মোকাবেলার সক্ষমতা বাড়ানো। এ বিষয়গুলোতেই আমরা কাজ করি।

এ কাজগুলো করার জন্য মাঠপর্যায়ে যে মূল্যবোধভিত্তিক এবং টেকসই প্রতিষ্ঠান দরকার, সেগুলো গড়ে তুলতে আমরা অর্থায়ন থেকে শুরু করে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন—সব ক্ষেত্রেই কাজ করি। তাই পিকেএসএফকে বলা যায় একটি 'ইনস্টিটিউশন-বিল্ডিং অর্গানাইজেশন', যা অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করে।

বৈশাখকেন্দ্রিক অর্থনীতিতে এ নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা কেমন? এ অর্থনীতিকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

বৈশাখ একটি বড় উৎসব, যা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এ ধরনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অর্থনৈতিক সম্পদে রূপান্তর করা যায়। পহেলা বৈশাখের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো—এ সময় আকস্মিকভাবে চাহিদা বেড়ে যায়। রঙতুলি থেকে শুরু করে পোশাক-আশাক, মিষ্টান্নসহ নানা ক্ষেত্রেই বিশাল চাহিদা তৈরি হয়। কিন্তু এ চাহিদা পূরণের জন্য অনেক আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে হয়। এ পণ্যগুলো সাধারণত বড় করপোরেট প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে পারে না। এগুলো মূলত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারাই তৈরি করে। এ ধরনের উৎসব অর্থনীতির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও ন্যায্যতাভিত্তিক বণ্টন। এখানে যে আয় তৈরি হয়, তা অনেক মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এর সঙ্গে একটি শক্তিশালী 'মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট'ও কাজ করে। ব্যবসায়ী, পরিবহন খাত—সবকিছুই এতে যুক্ত হয়। ফলে অল্প সময়ের জন্য হলেও অর্থনৈতিক কার্যক্রমের আকার অনেক বেড়ে যায়।

মো. ফজলুল কাদের

ব্যবস্থাপনা-পরিচালক
পিকেএসএফ

পিকেএসএফের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো এখানে কী ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে?

এ সময় অর্থনীতিতে শত শত এমনকি হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয়। এ লেনদেনগুলোকে যদি ডিজিটাল করা যায়, তাহলে এগুলো গ্রহণযোগ্য আর্থিক ডেটায় পরিণত হবে। এর ফলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণপ্রাপ্তির যোগ্যতা অনেক বাড়বে। এতে তারা ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থা থেকে সহজে অর্থায়ন পেতে পারবে এবং কার্যক্রম আরো বিস্তৃত করতে পারবে। আমরা তাদের সে ডিজিটাল সক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করছি।

আরেকটি বিষয় হলো, এ ধরনের ছোট উদ্যোক্তাদের পণ্যগুলোকে ব্র্যান্ডিং করা দরকার। বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি মানুষ বিদেশে থাকে। এ ডায়াসপোরা মার্কেটে আগে থেকেই পহেলা বৈশাখকে কেন্দ্র করে মার্কেটিং করা যেতে পারে। যদি বৈশাখের এক মাস আগে থেকেই পণ্যগুলো ওই বাজারে পৌঁছে দেয়া যায়, তাহলে উদ্যোক্তারা আরো ভালো দাম পাবে। একই সঙ্গে বিদেশে থাকা বাংলাদেশীরা তাদের সাংস্কৃতিক বন্ধনটাও ধরে রাখতে পারবে। দেশের সঙ্গে সংযোগটা আরো শক্তিশালী হবে। এ জায়গাগুলোতে আমাদের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ করার বড় সুযোগ আছে।

বৈশাখকে কেন্দ্র করে কি ঋণের চাহিদা বাড়ে?

হ্যাঁ, এ সময় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের স্বল্পমেয়াদি ঋণের প্রয়োজন হয়। এ ধরনের কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য হলো—হঠাৎ করে চাহিদা বাড়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সাধারণত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এ ধরনের স্বল্পমেয়াদি ঋণ দেয় না। এখানে তাদের প্রডাক্টগুলো পুনর্গঠন ও সাজানোর সুযোগ আছে। একই সঙ্গে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে ঋণগ্রহীতার বিশ্বাসযোগ্যতা বুঝতে পারে, সেজন্য ডিজিটাল লেনদেন তথ্য দরকার। কেনা-বেচা যদি ডিজিটাল উপায়ে হয়, তাহলে সেই তথ্য দেখেই আর্থিক প্রতিষ্ঠান সহজে আস্থা পেতে পারে।

মৌসুমভিত্তিক এ ব্যবসাগুলোকে কীভাবে টেকসই রূপান্তর করা যায়?

পহেলা বৈশাখ প্রতি বছরই আসে। এ পুনরাবৃত্তির কারণে এটাকে পরিকল্পিতভাবে অর্থনীতির অংশে পরিণত করা সম্ভব। শুধু উৎসবকেন্দ্রিক না থেকে আমরা একে আরো বিস্তৃতভাবে দেখার চিন্তা করছি। এ ধরনের উৎসবকে কেন্দ্র করে কিছু পণ্যের হঠাৎ চাহিদা তৈরি হয়। সেই চাহিদা মেটাতে গিয়ে আমাদের শাড়ি, কাপড়, পাঞ্জাবির ডিজাইন ও বৈচিত্র্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। কারিগররা নতুন নতুন পণ্য তৈরি করছে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এ পরিবর্তনটা চলমান। আজ থেকে ৫০ বছর আগে যে ধরনের পণ্য তৈরি হতো, এখন আর সেগুলো হয় না। এটা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার মধ্যেই যদি আমরা ডিজাইন উন্নত করতে পারি, পণ্যের গুণগত মান বাড়াতে পারি, তাহলে এগুলো আমাদের সাংস্কৃতিক সম্পদ হিসেবে বিশ্ববাজারেও জায়গা করে নিতে পারে। বিশ্বের অন্য দেশেও এমন উদাহরণ আছে। যেমন মেক্সিকোর ঐতিহ্যবাহী পোশাক এখন বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে, এমনকি যারা মেক্সিকান না, তারাও তা পরছে। আমাদের দেশের পাঞ্জাবিও একসময় এভাবে আন্তর্জাতিকভাবে জনপ্রিয় হতে পারে, যদি আমরা ডিজাইন ও গুণগত মানে উন্নতি করতে পারি।

আমাদের দেশে আরো অনেক বৈচিত্র্যময় পণ্য আছে, বিশেষ করে পরিবেশবান্ধব পণ্য। মৃত্তিকা দিয়ে তৈরি অলংকারসহ নানা ধরনের হস্তশিল্প এখন নতুনভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে। বিশ্বে এখন একটি প্যারাডাইম শিফট হচ্ছে। 'ইকোলজিক্যালি ফ্রেন্ডলি' পণ্যের চাহিদা বাড়ছে। এ সুযোগে যদি আমরা পণ্যের ডিজাইন উন্নত করতে পারি এবং একটি প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা তৈরি করতে পারি, তাহলে বিশ্ববাজারে দীর্ঘমেয়াদে অবস্থান তৈরি করা সম্ভব।

গ্রামীণ অর্থনীতি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দক্ষতা উন্নয়নে পিকেএসএফ কী ধরনের ভূমিকা পালন করছে?

শুরু থেকেই পিকেএসএফ এ ক্ষেত্রে কাজ করছে। গত প্রায় ৩৫ বছরে আমরা প্রায় ৪০ লাখ মানুষকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়েছি। এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এখন আমরা এ প্রশিক্ষণের সঙ্গে প্রযুক্তিকে আরো বেশি যুক্ত করছি, যাতে উদ্যোক্তারা প্রযুক্তিভিত্তিক পণ্য তৈরি করতে পারে। পাশাপাশি আমরা তাদের বিভিন্ন ধরনের সনদ নেয়ার জন্য সহায়তা করছি। কারণ বিশ্ববাজারে যেতে হলে আন্তর্জাতিক মানের সনদ প্রয়োজন।

বিশ্বে অনেক নিশ মার্কেট ও বুটিক মার্কেট আছে—যেগুলো ছোট হলেও উচ্চমূল্যের বাজার। যেমন রিসাইকেলড পণ্য, ন্যাচারাল ডাই—এসবের আলাদা বাজার আছে। এগুলো ছোট ছোট হলেও একত্রে একটি বড় বাজার তৈরি করে। চীন এ ধরনের বাজারের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করে উচ্চমূল্যের ভ্যালু-অ্যাডেড পণ্য বিক্রি করছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা কাজ করছি।

এ পর্যন্ত পিকেএসএফ প্রায় ১৫০টির মতো পণ্যের সনদ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করেছে। পাশাপাশি আমরা ঢাকার শ্যামলীতে একটি মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ প্রমোশন সেন্টার স্থাপন করছি। সেখানে মাইক্রো উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রদর্শন, বাজার সংযোগ এবং উচ্চমূল্যের বাজারে প্রবেশের সুযোগ তৈরি করা হবে। আমাদের লক্ষ্য, আমরা পথ দেখাব, অন্যরাও এগিয়ে আসবে এবং উদ্যোক্তারা সাহস পাবে।

কালবেলা
1 3 APR 2026

বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদারে আগ্রহী জার্মানি-সুইডেন

বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দুই দেশের রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

কালবেলা প্রতিবেদক ▸▸

বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে জার্মানি ও সুইডেন। গতকাল রোববার বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদিরের সঙ্গে পৃথক বৈঠকে ঢাকায় নিযুক্ত জার্মানির রাষ্ট্রদূত ড. রুডিগার লোটজ এবং সুইডেনের রাষ্ট্রদূত নিকোলাস উইক এই আগ্রহের কথা জানান। সচিবালয়ে বাণিজ্যমন্ত্রীর অফিস কক্ষে অনুষ্ঠিত এসব বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিভিন্ন দিক নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

জার্মানির রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠকে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, ইউরোপ বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের একটি প্রধান গন্তব্য। দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উভয় দেশই লাভবান হতে পারে। মন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কিছু নন-ট্যারিফ বাধা রয়েছে, যা দূর করতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এরই মধ্যে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে।

বৈঠকে বাণিজ্যমন্ত্রী জার্মানিকে বাংলাদেশের লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল ও লেদার খাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, দেশে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে সরকার বহুমুখী কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। প্রতি বছর প্রায় ২০ থেকে ২২ লাখ নতুন কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশি বিনিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এ সময় জার্মানির রাষ্ট্রদূত বলেন, জার্মানি বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও জোরদার করতে আগ্রহী। তিনি বাজারমুখী খাতে দক্ষতা উন্নয়ন এবং সম্ভাবনাময় বাজার উন্নয়নে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যে একটি সমান প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ প্রত্যাশা করেন।

জার্মানির রাষ্ট্রদূতের পর বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন সুইডেনের রাষ্ট্রদূত নিকোলাস উইক। বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদারের বিষয়ে আলোচনা হয়।

সুইডেনের রাষ্ট্রদূতকে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশ ও সুইডেনের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। সুইডেনের সঙ্গে নন-ট্যারিফ বাধা অপসারণে এরই মধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যা ভবিষ্যতে দুই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

এ সময় নিকোলাস উইক বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বাড়ানোর আগ্রহ প্রকাশ করে বলেন, টেলিকম খাতে সুইডেন বিশ্বে অগ্রণী দেশ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ খাতে তাদের উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ রয়েছে। তিনি বাংলাদেশের টেলিকম খাতে বিনিয়োগের আগ্রহ ব্যক্ত করেন।

The Business Standard

13 APR 2026

Hydroponics tent factory in Bepza EZ: $30.5m investment, 3,000 jobs expected

INDUSTRY – BANGLADESH

MD MASUD

Greenhouse hydroponics tent manufacturing is opening a new avenue for Bangladesh's export-oriented industrial sector. A modern production facility is being set up at the Bepza Economic Zone in Mirsarai, Chattogram, with an investment of $30.47 million by Hong Kong–China-based Green Pure Houseware (BD) Company Limited.

Stakeholders say this is not just a new factory – it marks a significant milestone in the country's industrial diversification.

According to officials at the Mirsarai Bepza Economic Zone, the project was approved in January this year. Following a deal signed with Bepza in March, the company was allocated six plots covering around 22,000 square metres. Construction has already been launched, with production expected to begin by March next year.

Hydroponics, or soilless farming technology, is rapidly gaining popularity worldwide. The specialised greenhouse tents used in this system help produce high-value crops in controlled environments. For the first time in Bangladesh, such products will be manufactured on an industrial scale – potentially opening access to a new global market.

Project sources said the factory will not only produce hydroponics tents but also EVA cabinet mats, cartons and PE packaging film, making it a multi-product manufacturing hub. The annual production target is set at around 4 lakh to 5 lakh units of tents and related products, primarily for export to the United States, Europe, the United Kingdom, Canada and Japan.

Stakeholders believe this investment could help reduce Bangladesh's heavy reliance on the ready-made I SEE PAGE 6 COL 5

garments sector. Hydroponics tents are non-traditional, high value-added products with rapidly growing global demand. As such, they could add a new dimension to the country's export basket and facilitate entry into higher-value markets.

From an economic perspective, job creation is one of the most significant aspects of the project. Once operational, the factory is expected to employ about 3,000 Bangladeshi workers, providing a major boost to the local economy in and around the Mirsarai economic zone. The project is also likely to stimulate growth in transport, housing, small businesses and service sectors.

Project Director of the Bepza Economic Zone, Md Enamul Haque, told The Business Standard that the initiative is part of a long-term strategic plan aimed at attracting investment, diversifying products and building high-tech industries. He added that Bepza is gaining investor confidence by ensuring a business-friendly environment and providing world-class infrastructure.

With rising global demand for agricultural technology and smart farming, stakeholders see hydroponics tent manufacturing as a timely initiative for Bangladesh. In the face of climate change, land scarcity and food security challenges, such technology could play an important role in the future.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো